SEM-VI (HONS)

CC PAPER XIII

History of Modern Europe II (1871-1945)

৪. হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীর বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর। এই আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি কিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে?

Ans: ১৯২৯ সালের থেকে যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়, তাতে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলিই যে শুধু জটিল হয়ে উঠেছিল, তা নয়, বৈদেশিক সম্পর্কও টালমাটাল হয়ে পড়ে। Young Commission এর সুপারিশসমূহ কার্যকর করবার মাধ্যমে জার্মানীর সাথে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর যে সাময়িক বোঝাপড়া হয়েছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে গেল। বৈদেশিক সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষেত্রে অসমতা ছিল, তা দূর করার দাবি উঠতে লাগল। পোল্যান্ডের সাথে জার্মানীর পূর্ব সীমান্তের রেখা টানবার সময় যে অন্যায় করা হয়েছিল

তার সুষ্ঠু সমাধান তখনও হয় নি। এছাড়া উপনিবেশগুলি ছিনিয়ে নিয়ে সাম্রাজ্যের সুবিধা থেকে তাকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে মিত্রপক্ষ জার্মানীর ওপর যুদ্ধাপরাধের কলঙ্ক লেপন করে ক্ষতিপূরণের এক বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে হিটলার তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে সচেষ্ট হলেন।

১৯৩৩ সালে ক্ষমতা দখল করে হিটলার তাঁর গ্রন্থ মেইন ক্যাম্ফ -এ উল্লেখিত পররাষ্ট্র-নীতির কাঠামো অনুসরণ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনা এবং জার্মানীকে ইউরোপের একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। দ্বিতীয়ত, তিনি ভার্সাই চুক্তি ও সেন্ট জার্মেইন চুক্তি বাতিল করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন, কারণ এই চুক্তিগুলি সবদিক থেকে জার্মানদের অবনত করার চেষ্টা করেছিল। তৃতীয়ত, যেহেতু হিটলারের মতে জার্মানজাতি ছিল একটি শ্রেষ্ঠ জাতি এবং অন্যদেশের ওপর আধিপত্য তিনি বিস্তার করা ছিল তার স্বাভাবিক অধিকার, সেহেতু তিনি ইউরোপ ও বহির্বিশ্বে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা করলেন। চতুর্থত, নাৎসীবাদ নীতি প্রয়োগেই ঘোষণা করলেন। হিটলার সম্প্রসারণ-আদর্শগতভাবে সাম্যবাদের বিরোধী ছিল। হিটলার সম্প্রসারণশীল পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে পূর্ব-ইউরোপকে বেছে নিলেন। সাম্যবাদ বিরোধী মনোভাব পূর্ব অভিমুখে বিস্তার নীতিকে পরিপুষ্ট করেছিল। অধ্যাপক এ. জে. পি. টেলর মন্তব্য করেছেন: "Eastern expansion was the primary purposes of the policy, if not the only one".

<u>বৈদেশিক নীতির দুইটি পর্যায়:-</u>

<u>প্রথম পর্যায়:-</u> যুদ্ধনীতি হিটলারের মূল হাতিয়ার হলেও হিটলার দেশকে কিছুটা প্রস্তুত করার পূর্ব পর্যন্ত শান্তির পথ

অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিলেন। (১) পূর্ব সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার জন্যে ১৯৩৪ সালে পোল্যান্ডের সাথে ১০ বছরের জন্যে এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। (২) ১৯৩৩ সালে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে জার্মানী ফ্রান্সের সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করার দাবি করল। কনফারেন্স এই দাবি স্বীকার করতে অস্বীকার করলে হিটলার জার্মান প্রতিনিধিকে উক্ত কনফারেন্স ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে জার্মানী জাতিসংঘ ত্যাগ করবার ও নোটিশ দেয়। (৩) অতঃপর জার্মানী ভার্সাই- সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করে সামরিক শক্তি অত্যন্ত দ্রুত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হল। ১৯৩৫ সালের জুন মাসে ব্রিটেন জার্মানীর সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা অনুসারে ডুবো জাহাজসহ ইংল্যান্ডের নৌ-শক্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জার্মানীর নৌ-শক্তি গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। (৪) ১৯৩৫ সালে ইতালী যখন ইথিওপিয়া আক্রমণ করে, তখন হিটলার ইতালীকে সমর্থন করেন। এইভাবে তিনি ইতালীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। (৫) ইতালীর দ্বারা ইথিওপিয়া আক্রান্ত হলে জাতিসংঘ তা প্রতিরোধ করার মত কার্যকর কিছুই করতে পারে নি। অথচ মিত্রপক্ষের অভ্যন্তরে দুর্বলতা ও বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই সুযোগে ১৯৩৬ সালে ভার্সাই সন্ধির শর্ত ও লোকার্নো -চুক্তির প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে হিটলার রাইন অঞ্চলে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন।

<u>দ্বিতীয় পর্যায়ে</u> :- ভার্সাই সন্ধি উপেক্ষা করে জার্মানী রাইন অঞ্চলে সামরিক শক্তি প্রেরণ করলে মিত্ররাষ্ট্রবর্গ কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। তাদের এই ব্যর্থতা হিটলারকে আরও সক্রিয় বৈদেশিক নীতি অনুসরণে উৎসাহিত করল। (১) স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্টপন্থী জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ করলে জার্মানী প্রকাশ্যে তাকে সমর্থন করল। স্পেনে ফ্রাঙ্কো জয়যুক্ত হলে হিটলার তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন। (২) হিটলার অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে তাঁর নাৎসীদলের কার্যকলাপে উৎসাহ দান করলে এক সংকটের সৃষ্টি হয়। ইতালী তখন ইথিওপিয়ার যুদ্ধে ব্যস্ত। সেই সুযোগে হিটলার অস্ট্রিয়া সরকারের সাথে একটি সাময়িক

বোঝাপড়া করলেন। যার ফলে অস্ট্রিয়া নিজেকে একটি জার্মান রাজ্য বলে ঘোষণা করল এবং হিটলার ও তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিলেন। ③ ১৯৩৬ সালে নভেম্বর মাসে হিটলার জাপানের সাথে কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। পরের বছর ইতালীও জার্মানীর সাথে অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করল। অতঃপর হিটলার জার্মানী, জাপান ও ইতালী রাষ্ট্রগুলির এক জোট তৈরী করলেন, যা রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ নামে পরিচিত।
④ এবার হিটলার অস্ট্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলেন। তাঁর ইঙ্গিতে অস্ট্রিয়ার নাৎসী দল আবার আন্দোলন শুরু করে। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার সুসনিগের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সুযোগে হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করলেন। ⑤ এরপর চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চলের জার্মানরা আন্দোলন শুরু করলে হিটলার তাঁর সীমানায় সৈন্য সমাবেশ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া সাহায্য চাইলে রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল।
⑥ কিন্তু ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তোষণনীতি অবলম্বন করে বারবার হিটলারের সাথে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। অবশেষে মিউনিক অঞ্চলে হিটলার, চেম্বারলেন, দালাদিয়ার ও মুসোলিনির মধ্যে এক বৈঠক হল। এই স্থানে ১৯৩৮ সালে মিউনিক-চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, যার দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মতামতের অপেক্ষা না করে সুদেতান অঞ্চল জার্মানী দেওয়া হল। কিছুদিনের মধ্যে সুদেতান অঞ্চল ছাড়াও সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলারের কুক্ষিগত হল।
⑦ এরপর ভীতি প্রদর্শন করে হিটলার লিথুয়ানিয়ার নিকট থেকে মেমেল দখল করেন। ⑧ এরপর তিনি পোল্যান্ডের কাছ থেকে ডানজিগ দাবি করলেন এবং সাথে সাথে পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে জার্মানীর দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সংযোগ-ভূমি ও দাবি করলেন। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজনীতিকরা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তোষণনীতি দ্বারা তাঁরা হিটলারকে তাদের পথে আনতে পারবেন না, তাই তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, পোল্যান্ড আক্রান্ত হলে তাঁরা পোল্যান্ডের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

এর ফলে এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। হিটলার বুঝলেন যে, রাশিয়ার সাথে একটি বোঝাপড়া না করে আর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। রাশিয়াও হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্র-পক্ষীয় ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে যুদ্ধ থেকে সরে থাকার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সুতরাং হিটলার ১৯৩৯ সালে রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

অতঃপর, ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ডের পক্ষ অবলম্বন করলে জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।